



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 650 - 658

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

নৈতিকতা ও ধর্ম প্রসঙ্গে কান্ট এবং বঙ্কিমের দর্শন : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

নিবেদিতা দেবনাথ

সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রী কলেজ, সিঙ্গুর, হুগলি

Email ID : debnathnibedita2024@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

*Immanuel Kant,
Morality, Duty,
Categorical
Imperative,
Religion,
Bankimchandra
Chattopadhyay,
Utilitarianism,
Dharma Tatwa,*

Abstract

The question of ethics and religion has remained central to philosophical inquiry across cultures and epochs. Immanuel Kant, one of the most influential philosophers of the Enlightenment era, developed a rigorous system of moral philosophy that emphasized autonomy, duty, and rationality. His ethical thought, grounded in the notion of the categorical imperative, holds that moral actions must be governed by principles that can be universally applied, irrespective of personal desires or religious doctrines. Kant's works—Critique of Pure Reason, Groundwork of the Metaphysics of Morals, Critique of Practical Reason, and Religion within the Limits of Reason Alone—articulate a vision of morality rooted in human reason, where religion, though significant, must align with rational moral principles.

In contrast, Bankimchandra Chattopadhyay, a towering figure in 19th-century Bengal, approached the relationship between ethics and religion from a culturally distinct standpoint. Initially influenced by Western utilitarianism, Bankim's early thought leaned toward the idea that moral value is determined by the usefulness or consequences of actions. However, his later writings reflect a marked departure from this view, embracing a deeper integration of Indian religious philosophy, particularly drawn from Hindu scriptures, epics, and Puranic literature. His seminal work Dharma tatwa reveals a mature ethical framework wherein Dharma—often loosely translated as religion or duty—emerges as a guiding principle rooted in spiritual and cultural consciousness rather than abstract universal reason alone.

This comparative analysis highlights the divergent foundations of Kant's and Bankimchandra's moral philosophies. Kant builds from a rational, deontological perspective where the individual's moral will is sovereign, while Bankimchandra evolves toward a culturally embedded moral vision that harmonizes reason, faith, and tradition. Yet, both philosophers converge on the recognition that morality cannot be fully separated from human dignity and



the inner moral sense, even though they arrive at this insight from different civilizational and intellectual trajectories.

By juxtaposing Kant's rationalist ethics with Bankimchandra's culturally rooted moral vision, this paper invites a broader reflection on the universality and particularity of moral thought. It seeks to explore how ethical systems are shaped not only by logical consistency but also by the spiritual, historical, and cultural contexts from which they emerge. The dialogue between Kant and Bankim thus opens new pathways for a more inclusive and cross-cultural moral philosophy.

Discussion

কান্টের নৈতিকতার ধারণা : জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (1724-1804)-এর মতে নৈতিক দর্শনের মূল উদ্দেশ্য হল একটি সার্বিক নৈতিক মানদণ্ড খুঁজে বার করা। একাধিক নৈতিক নিয়ম স্বীকার করলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে, সকল মানুষকে একইভাবে নৈতিক দায়বদ্ধ করা যাবে না। তাই নৈতিক বিচারের ভিত্তি শেষপর্যন্ত একটি নৈতিক নীতি প্রতিষ্ঠা করা, যা সকল মানুষের উপর সমানভাবে বর্তাবে।

এখানে প্রশ্ন ওঠে নৈতিক নিয়ম যদি একটিই হয় তবে কাজের ভালো মন্দ ও ব্যক্তির ভালো-মন্দ উভয়ই তার দ্বারাই নির্ধারিত হবে, কিন্তু তা কি সম্ভব? যাঁরা এর উত্তরে না বলেছেন অর্থাৎ কাজের ও ব্যক্তির ভালো-মন্দ বিচার একটি নৈতিক নিয়মের দ্বারা করা সম্ভব নয় তাঁরা নৈতিক দ্বৈতবাদী। কিন্তু কান্ট নৈতিক দ্বৈতবাদী নন, তিনি একটিই নীতি দ্বারা উভয়েরই ভালো মন্দ বিচার করা যায় বলে স্বীকার করেছেন। তিনি নৈতিক অদ্বৈতবাদী।

কান্ট তাঁর নীতিবিদ্যা সংক্রান্ত আলোচনায় মানুষের দু'ধরনের বৃত্তির কথা উল্লেখ করেছেন। একটি হল ইন্দ্রিয় বৃত্তি (sensitivity) এবং অপরটি বুদ্ধিবৃত্তি (understanding)। ইন্দ্রিয়পরায়ণ জীব হিসাবে মানুষ পশুর সমগোত্রীয় ও সুখের দ্বারা পরিচালিত। অপরদিকে বুদ্ধিবৃত্তি যুক্ত জীবরূপে মানুষ ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে অতিক্রম করে যায় এবং বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়। 'Groundwork of The Metaphysics of Morals' গ্রন্থে কান্ট বুদ্ধিবৃত্তি দুটো রূপের কথা বলেন-

- I. তাত্ত্বিকবুদ্ধি বা বিশুদ্ধ বুদ্ধি (Theoretical or Pure reason), যার দ্বারা জ্ঞানবিদ্যা ও অধিবিদ্যার চর্চা হয়ে থাকে।
- II. ব্যবহারিক বুদ্ধি বা Practical reason, যার দ্বারা নৈতিক নিয়ম বা Moral principle নির্ধারিত হয়ে থাকে।

কান্টের মতবাদ মূলত তিনটি বিবৃতির ওপর নির্ভরশীল -

(ক) সদিচ্ছাই একমাত্র শর্তহীনভাবে ভালো (Good will alone is good) -

কান্ট সদিচ্ছার (Good Will) কথা দিয়ে তার নৈতিক আলোচনা শুরু করেছেন বলে মনে করা যেতে পারে, তিনি ব্যক্তির নৈতিক ভালো-মন্দ বিচারের দিকটি দিয়েই আলোচনা শুরু করতে চেয়েছেন। সাধারণতঃ কোন ব্যক্তি যদি মন্দ অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য নিয়ে ভালো কাজও করে তাও আমরা তাকে মন্দই বলে থাকি। অর্থাৎ কোন কাজের পিছনে তার অভিপ্রায়ই মূল বিচার্য বিষয়। যেমন কটু সত্যভাষণ নিন্দিত হবে, যদিও সত্যিকথা বলা হয়েছে তবু তার পিছনে অভিপ্রায় ছিল কটু কথার দ্বারা ব্যক্তিকে মানসিক কষ্ট দেওয়া। তাই কান্ট নৈতিক মানদণ্ড হিসাবে সবসময়ই সদিচ্ছার কথা বলেছেন। সদিচ্ছা প্রসঙ্গে কান্ট বলেন সদিচ্ছাই হল একমাত্র শর্তহীনভাবে ভালো। তাঁর মতে, -

"It is impossible to think of anything at all in the world, or indeed even beyond it, that could be considered good without limitation except a good will."¹



শর্তহীন ভাবে ভালোই একমাত্র সদিচ্ছা হিসাবে গণ্য হতে পারে। এক্ষেত্রে ‘impossible’ বা অসম্ভব কথাটিকে কান্ট যৌক্তিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি মনে করেন, ‘শর্তনির্ভর ভালো’ হওয়ার সঙ্গে ‘সদিচ্ছা’র এটি যৌক্তিক বিরোধ আছে।

Good Will-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কান্ট প্রথমত : ‘Will’ এবং ‘Wish’ মধ্যে পার্থক্য করেছেন। Wish হল নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ তা বাস্তবে পরিণত হলে খুশি হব কিন্তু তাকে বাস্তবায়িত করার কোন চেষ্টা কর্তার তরফে থাকে না। অপরদিকে Will হল সক্রিয়, অর্থাৎ কর্তা আশ্রয় চেষ্টা করে তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য। কাজেই বলা যায়, কোনো ব্যক্তির সদিচ্ছা আছে তখনই বলা যাবে যখন ওই ব্যক্তির সদিচ্ছার যেটি উদ্দেশ্য বা বিষয় তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সে যথাযথ চেষ্টা করবে।

দ্বিতীয়ত : কান্টের মতে সদিচ্ছাই একমাত্র শর্তহীনভাবে ভালো। সদিচ্ছা কোন বাহ্যিক শর্তের অধীন নয়। প্রতিটি কাজই কোন না কোন পরিস্থিতিতেই ঘটে। কিন্তু কান্টের মতে এই পরিস্থিতি সদিচ্ছার ভালো হওয়াকে তৈরি বা ধ্বংস করতে পারে না। সদিচ্ছা সব পরিস্থিতিতেই ভালো। সদিচ্ছা পরিস্থিতি বা ফলাফল কোন শর্তের দ্বারাই আবদ্ধ নয়। সদিচ্ছা জনিত কাজের ফল খারাপ হলেও আমরা ইচ্ছাটাকে খারাপ বলতে পারি না, আবার ইচ্ছাটি ভালো না হলে ফলাফল যতই ভালো হোক কাজটিকে ভালো বলা যায় না। কোন দুর্বলতার বা প্রতিকূলতার জন্য ফলাফল মন্দ হলেও তার পিছনের অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য যদি ভালো হয় কাজটিকে ভালো বলতে হবে। অর্থাৎ সদিচ্ছা সফল হলেও ভালো, বিফল হল ভালো। তাই কান্ট বলেন যে, সদিচ্ছা তার স্বরূপেই ভালো (A Good Will is good in itself) এবং সেই কারণেই সদিচ্ছা শর্তনিরপেক্ষভাবে ভালো। এই নীতিটিকে কান্ট মূল নৈতিক নীতি বা The Supreme Principal of Morality বলেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কান্ট বুদ্ধি, মানসিক প্রতিভা, ক্ষমতা, অর্থ, সাহস, দৃঢ়তা ইত্যাদি কোন চারিত্রিক গুণকেই ভালো গুণ বলতে অস্বীকার করেননি। তাঁর মতে এগুলি কোনোটিই স্বতন্ত্র ভাবে ভালো নয় অর্থাৎ শর্তহীনভাবে ভালো নয়। একমাত্র সদিচ্ছাই শর্তহীন ভাবে ভালো। কেননা যদি কু-অভিপ্রায় দ্বারা এইগুলি পরিচালিত হয় তবে তা আর ভালো গুণ হিসাবে বিবেচিত না হয় বরং দোষ হিসেবে পরিগণিত হবে। স্পষ্টতই কর্মফলকে গুরুত্ব না দিয়ে কর্ম নীতিকে গুরুত্ব দাওয়া হয়েছে। তিনি ফলমুখী নৈতিকতা বা Teleological morality-কে ত্যাগ করে কর্তব্যমুখী নৈতিকতাকে (Deontological morality) সমর্থন করেছেনⁱⁱ তাঁর মতে সদিচ্ছা প্রণোদিত কর্মের ক্ষেত্রেই কেবল মানুষের ইচ্ছা স্বাধীন (Autonomy of will); কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য প্রণোদিত কর্মের ক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছা পরাধীন (Heteronomy of will)। কেবল সদিচ্ছা প্রণোদিত স্বাধীন কর্মই কান্টের মতে নৈতিক কর্ম।

(খ) কর্তব্যই কর্তব্যসাধনের লক্ষ্য (Duty for the sake of duty) :

সদিচ্ছাই ব্যক্তির কাছে কর্তব্য রূপে হাজির হয়। সদিচ্ছা প্রণোদিত হয়ে বিবেকের নির্দেশে কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করাই নৈতিক কর্ম। তবে কান্টের মতে শুদ্ধ ব্যবহারিক বুদ্ধি নির্দেশিত নীতি বা মূল নৈতিক নীতিই কর্তব্য নয়, বরং এই ব্যাপারে মানুষের মধ্যে দায়বদ্ধতা তথা মানসিক অবরোধও থাকতে হবে। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন কাজ করলে সেই ব্যাপারে তার কোন দায়বদ্ধতা থাকে না তাই তাকে কর্তব্য বলা যায় না। মানুষ ইন্দ্রিয় অনুভূতি, কামনা-বাসনা ইত্যাদি মানসিক প্রবৃত্তির দ্বারা কাজে অবরোধ অনুভব করে। অতঃ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন জীব হওয়ায় এই অবরোধ নিয়ন্ত্রণ করার নৈতিক প্রয়োজনীয়তাটিও অস্বীকার করতে পারে না। কর্তব্যের ধারণা প্রসঙ্গে কান্ট বলেন, -

“...the concept of duty, which contains that of a good will though under certain subjective limitations and hindrances, which, however, far from concealing it and making it unrecognizable, rather bring it out by contrast and make it shine forth all the more brightly.”ⁱⁱⁱ

এই প্রসঙ্গে কান্ট ঐশ্বরিক ইচ্ছা বা বিশুদ্ধ সদিচ্ছা (Divine holy will) ও অবরোধযুক্ত সদিচ্ছার (good will under human conditions) মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে ঐশ্বরিক ইচ্ছা স্বতঃই ব্যবহারিক বুদ্ধি নির্দেশিত হয় বলে এতে



কোন মানসিক বাধা থাকে না। তাই এটি কর্তব্য হিসাবে পরিগণিত হয় না। কান্টের ভাষায়, সাধারণ ভাবে ঐশ্বরিক ইচ্ছা বা বিশুদ্ধ ইচ্ছায় কোন অনুজ্ঞা থাকে না অথবা ধার্মিক ব্যক্তির কোন দায়বদ্ধতা থাকে না। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই অবরোধযুক্ত সদিচ্ছাই বিদ্যমান, যার প্রতিটি প্রয়াসই তাই কর্তব্য (duty) বা দায়বদ্ধতা (obligation)।

কান্টের নীতি তত্ত্ব অনুসারে মেহ, প্রেম, দয়া-মায়া ইত্যাদির বসবর্তি হয়ে কোন কাজ করলে তা ব্যক্তিগত, সামাজিক, পারিবারিক বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভালো বলা হলেও তা নৈতিক কর্ম বলে বিবেচিত হবে না। সমস্ত রকম প্রবণতা, আবেগ অনুভূতি ইত্যাদিকে সংযত রেখে কেবলমাত্র সদিচ্ছার পূর্বতঃসিদ্ধ (a-priori) আকারনিষ্ঠ নীতির ভিত্তিতে কর্তব্য সাধনই একমাত্র নৈতিক কর্ম হিসাবে বিবেচিত হয়।

(গ) নৈতিক নিয়ম এক নিঃশর্ত অনুজ্ঞা বা আদেশ (moral law is a Categorical Imperative) :

কান্ট আমাদের ব্যবহারিক বুদ্ধি (Practical reason) বা প্রজ্ঞা থেকে অর্থাৎ বিবেক থেকে যে নৈতিক নিয়ম নির্গত হয় তাকে নিঃশর্ত অনুজ্ঞা (Categorical imperative) বলেছেন। অনুজ্ঞা হল মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কাজের নৈতিক গুণাগুণ বিচার করার নিয়ম। স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মানুষ যদি এই নৈতিক নিয়ম পালন করে তাহলে তা অনুজ্ঞা রূপে গণ্য হবে না। কিন্তু প্রজ্ঞাবান মানুষ হিসাবে সে অপূর্ণতা ও প্রবৃত্তির লাঞ্ছনা অতিক্রম করে, সচেতন ভাবে এই নৈতিক নিয়ম মেনে চলাই অনুজ্ঞার স্বরূপ। অনুজ্ঞা আবার দু প্রকার - শর্তাধীন ও শর্তহীন। অনুজ্ঞা নির্দেশিত কর্ম কোন লক্ষ্য বা বিষয় লাভের উপায় হিসেবে বিবেচিত হলে তা শর্তাধীন অনুজ্ঞা। যেমন যদি পরীক্ষায় ভালো ফল পেতে চাও তবে মন দিয়ে পড়াশোনা কর। এক্ষেত্রে কেউ পড়াশোনা করবে যদি সে পরীক্ষায় ভালো ফল পেতে চায়, নচেৎ নয়। অপরদিকে অনুজ্ঞা নির্দেশিত কর্ম নিজেই যদি ভালো বলে বিবেচিত হয় তবে সেই অনুজ্ঞাটি শর্তহীন হবে। যেমন সদা সত্য কথা বলবে। সত্য কথা বললে কোনো কামনা-বাসনা বা আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হবে এরকম কোন নির্দেশ এই অনুজ্ঞাতে নেই। কেবলমাত্র কর্তব্যবোধ রূপেই আমরা এটি মেনে চলতে বাধ্য। অর্থাৎ সত্য কথা বলার উদ্দেশ্যে সত্য কথা বলা কর্তব্য।

কান্টের মতে নৈতিক নিয়ম হল শর্তহীন অনুজ্ঞা, এখানে কোন শর্তের উল্লেখ থাকে না। এই নৈতিক নিয়ম ব্যবহারিক প্রজ্ঞা লব্ধ হওয়ায় তা পূর্বতঃসিদ্ধ (a-priori), পরতঃসাধ্য (a-posteriori) নয়। এই নিয়ম সার্বজনীন। এই নৈতিক নিয়মে যা করণীয় বলে নির্দেশিত হয় সকল পরিস্থিতিতেই ব্যতিক্রমহীন ভাবে তা করণীয় বলে বুঝতে হবে।^{iv} এই ব্যবহারিক সূত্রটি (Practical Principal) দু'ভাগে বিভক্ত - ব্যক্তিগত সূত্র (Subjective principle) এবং নৈব্যক্তিক সূত্র (Objective principle)। ব্যক্তিগত সূত্রগুলি শর্তাধীন কর্তা কেবল নিজের কাজে তা প্রয়োগ করে, যেমন আমি রাত এগারোটায় ঘুমোবো। এই নিয়ম সবার বেলায় প্রযোজ্য নয়। এখানে কোন বাধ্যবাধকতা নেই বা ভালো-মন্দের বিচার নেই। অপরদিকে নৈব্যক্তিক সূত্রগুলি সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা সার্বজনীন যেমন 'দরিদ্র লোককে সাহায্য করা' উচিত, এখানে একরকম বাধ্যবাধকতার উল্লেখ থাকে। এই নৈব্যক্তিক সূত্রই শর্তহীন অনুজ্ঞা।

শর্তহীন অনুজ্ঞা কোন কর্মের মানদণ্ড নয় বরং আমরা আমাদের বিভিন্ন কাজে যে ব্যক্তিগত নীতিটি অনুসরণ করি তার গ্রহণযোগ্যতা বিচার করা হয় শর্তাধীন অনুজ্ঞা দ্বারা। এই ব্যক্তিগত নীতিটিকে কান্ট Maxim বা কর্মনীতি বলেছেন। যেমন সত্য কথা বলা কর্তব্য, এখানে একটি নীতির জন্ম হয় সেটি হল সত্য কথা বলা নীতি (maxim of speaking truth)। অর্থাৎ যাবতীয় কাজ যেগুলি সত্য কথা বলা হিসাবে চিহ্নিত হবে সেগুলি এই কর্মনীতির আওতায় পড়বে। কান্টের মধ্যে এই ম্যাক্সিম বা কর্মনীতিগুলি যদি মূল নৈতিক নীতির দ্বারা অনুমোদিত হয় তাহলে সেই নীতিটিও নৈতিক নীতি হিসেবে গৃহীত হবে। ফলে এই নীতির আওতায় পড়া যাবতীয় কাজ ভালো বা মন্দ হিসাবে চিহ্নিত হবে। কান্টের মতে নৈতিকতা কখনোই পরিবর্তনযোগ্য নয়, তাই নীতিগুলি সবসময়ই সার্বিক ও আবশ্যিক হবে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যেহেতু সার্বিকতা ও আবশ্যিকতা পাওয়া সম্ভব নয় তাই এই নীতিগুলি অভিজ্ঞতা পূর্ব। এই গুলি শুদ্ধ ব্যবহারিক বুদ্ধি (pure practical reason) দ্বারা গঠিত বলে কান্ট মনে করেছেন।



কান্টের মতে অনুজ্ঞা বা আদেশ তিন প্রকার - শর্তাধীন আদেশ (Hypothetical imperative), বাস্তব আদেশ (Assertorical imperative) ও নিঃশর্ত আদেশ (Categorical imperative)। কান্ট এই নিঃশর্ত আদেশ বা অনুজ্ঞার তিনটি রূপের কথা বলেছেন।

- প্রথম রূপটি হল-

“Act only on that Maxim whereby you can at the same time will that it should become a Universal Law.”^v

অর্থাৎ আমাদের সেই নীতি অনুযায়ী কাজ করা উচিত যেটিকে আমরা সার্বিক বিধিতে পরিণত করতে পারব। কান্ট বিভিন্ন দৃষ্টান্তের সাহায্যে দেখান যে সব ব্যক্তিগত নীতি সার্বজনীন বিধিতে পরিণত করা যায় না। যেমন - আত্মহত্যা করতে উদ্যোগী ব্যক্তির ব্যক্তিগত নীতিটি হল ‘জীবন যদি সুখের তুলনায় বেশি দুঃখ দেয়, তাহলে আত্মপ্রীতির থেকে আত্মহত্যা শ্রেয়’। এখানে আত্মপ্রীতি ও আত্মহত্যা নীতির মধ্যে স্ববিরোধ দেখা যায়। এই আত্মহত্যা নীতিকে সার্বজনীন নীতিতে পরিণত করা হলে অনেকেই খুব সহজে আত্মহননে পথ বেছে নেবে। তাই আলোচ্য কর্মনীতিটি অনুসরণযোগ্য নয়।

- দ্বিতীয় সূত্রটি হল, -

"Act in such a way that you treat humanity, whether in your own person or in the person of another, always at the same time as an end, never merely as a means."^{vi}

অর্থাৎ প্রজ্ঞাবান মানুষ নিজেকে এবং অপরকে লক্ষ্যবস্তু হিসাবে গণ্য করে সেই লক্ষ্য সাধনে প্রবৃত্ত হলে সমাজ এক ‘উদ্দেশ্যের সাম্রাজ্য’ পরিণত হবে। এটি প্রতিটি মানুষকে মর্যাদা দেয় ও আত্মসম্মানের উপর জোর দেয়।

- তৃতীয় রূপটি হল, -

"So act as if you were through your maxims a law-making member of a kingdom of ends."^{vii}

অর্থাৎ মানুষকে কেবল নিয়ম পালনকারী নয়, সেই নৈতিক নিয়ম রচনাও করে। নিঃশর্ত অনুজ্ঞা পালনে মানুষ তখনই দায়বদ্ধ থাকবে যদি এবং কেবল যদি তা স্বতঃআরোপিত হয়।

কান্টের মতে এই নৈতিক নিয়মকে ভালোবাসাই হল চরম আদর্শ। এই আদর্শকে সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত না করা গেলেও মানুষের নিরলস প্রয়াস করে যেতে হবে তা বাস্তবায়িত করার জন্য। এই কাজেই মানুষ এক বিশেষ ধরনের তৃপ্তি লাভ করে। যা বৌদ্ধিক তৃপ্তি (Intellectual Contentment)। যে কাজ কর্তা কেবল কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে করে তার দ্বারাই এই বৌদ্ধিক তৃপ্তি লাভ হয়। এই জাতীয় তৃপ্তির মূল উৎস হল ইন্দ্রিয়ে নিয়ন্ত্রণ। কান্টের মধ্যে মানুষ তার সীমাবদ্ধতার জন্য এই পরম তৃপ্তি বা পরম সুখ লাভে সক্ষম হয় না। কিন্তু কান্টের নীতিতত্ত্বে ভবিষ্যৎ সুখী সমাজের সম্ভাবনা নিহিত আছে, যেখানে প্রতিটি মানুষ হবে ধার্মিক (virtuous) ও সুখী। কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করাই ধর্ম (Virtue)^{viii} কর্তব্যের জন্য কর্তব্য সাধনের মধ্যেই পরম কল্যাণ (Supreme good) নিহিত আছে। এই পরম কল্যাণের সাথে সুখ বা আনন্দের যোগ সাধনই হল পরিপূর্ণ কল্যাণ (Complete good)। বাস্তবে শুধুমাত্র কর্তব্যবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করে এমন মানুষ সংখ্যায় বিরল হলেও ভবিষ্যতে সুখী জগতের আশা কিন্তু অলীক কল্পনা মাত্র নয়। কান্টের মতে মানুষ প্রজ্ঞার অধিকারী তাই তার পক্ষে ধার্মিক হওয়া সম্ভব। ধর্মের অনিবার্য পরিণতি হল সুখ এবং সে কারণেই সুখী হওয়াও সম্ভব।



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : ঊনবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যে একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যাকে জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু পুনর্জাগরণ বা নবজাগরণের অন্যতম দূত হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁর লেখায় ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনের সর্বঙ্গীণ আলোচনা পাওয়া যায়। তিনি একাধারে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব এবং ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল অপরিমিত। বাংলার নব্য লেখকের প্রতি তাঁর নিবেদন ছিল, -

“যশের জন্য লিখিবেন না... টাকার জন্য লিখিবেন না... লিখিয়া দেশের বা মনুষ্য জাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্যই লিখবেন।”^{ix}

বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শনে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রথমদিকে তাঁর চিন্তাধারা বিভিন্ন পাশ্চাত্য দার্শনিক যেমন Jacques Rousseau (1712-1778), Jeremy Bentham (1748-1832), Auguste Comte (1798-1857), John Stuart Mill (1806-1873), Henry Thomas Buckle (1821-1862), Wilham Lacky (1838-1903) প্রমুখদের দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ছিল। তাদের মত বঙ্কিমচন্দ্র ও ধর্মীয় নীতি ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন। আবার পরবর্তীকালে তাঁর লেখায় আমরা ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র, উপনিষদ ইত্যাদির প্রভাব সুস্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করতে পারি। তাঁর মতে হিন্দু ধর্ম, অন্যান্য সামগ্রিক নৈতিক নিয়মাবলী, ব্যক্তির আচরণ ও সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। মূলত হিন্দু ধর্ম তত্ত্ব ও নীতি তত্ত্ব কখনোই পৃথকভাবে গড়ে ওঠেনি, কারণ ধর্মচিন্তা ও অন্যান্য বিষয়ক চিন্তা এই ধর্মে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বঙ্কিমচন্দ্র ও উপযোগবাদ : বঙ্কিমচন্দ্রের নৈতিকতা বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ব্যাপকভাবে পাশ্চাত্য দার্শনিক, যেমন মিল, বেঙ্হাম, ব্রডলে প্রমুখদের দ্বারা প্রভাবিত। পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যায় আমরা দু’ধরনের নৈতিকতার পরিচয় পাই - কর্তব্য নির্ভর নৈতিক তথ্য এবং সদগুণ (Virtue) নির্ভর নৈতিক তত্ত্ব। এই কর্তব্য নির্ভর নৈতিক তত্ত্ব আবার দু’ভাগে বিভক্ত, একটি হল কর্তব্যমুখী নৈতিক তত্ত্ব এবং অন্যটি হল ফলমুখী নৈতিক তত্ত্ব। এই ফলমুখী নৈতিক তত্ত্বই উপযোগবাদ হিসাবে পরিচিত। মিল, বেঙ্হাম প্রমুখ চিন্তাবিদ এই তত্ত্বের সমর্থক। উপযোগবাদ অনুসারে, কোন কর্মের নৈতিকতা নির্ভর করে সেই কাজ থেকে উৎপন্ন ফলের উপর। অর্থাৎ কোন কর্ম নৈতিক হবে যদি তা সর্বাধিক উপযোগ উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়।

সদগুণ বা ধর্ম (virtue) নির্ভর নৈতিক তত্ত্বের সমর্থক ছিলেন আরিস্টটল। এই মত অনুসারে, কর্ম নয় মূলত কর্তার নৈতিকতাই নীতিবিদ্যার বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সদগুণের অধিকারী সেই ব্যক্তি নৈতিক এবং তার কৃতকর্ম নৈতিক কর্ম। বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন রচনায় আমরা যে নৈতিকতার পরিচয় পাই তাতে মিল, বেঙ্হামের উপযোগবাদ, যাকে তিনি ‘হিতবাদ’ বলে উল্লেখ করেছেন তার প্রভাব যথেষ্ট স্পষ্ট। তবুও তার রচনার গভীর বিশ্লেষণ করলে উপলব্ধি করা যায় যে সদগুণ নির্ভর নৈতিকতার প্রতিও তিনি আগ্রহী ছিলেন।

বেঙ্হামের Principles of Morals and Legislation এবং মিলের Utilitarianism গ্রন্থে উপযোগবাদের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁদের মতে উপযোগিতার নীতি (Principle of Utility) মেনে যদি কোন কর্ম করা হয়, তবেই তা সর্বাধিক উপযোগিতা দেয়। সেই কাজই নৈতিক কর্ম হবে, অন্যথায় তা অনৈতিক বলে বিবেচিত হবে। তাঁর মতে,-

“উপযোগিতার নীতি বলতে সেই নীতিকে বোঝায় যা যেকোনো ধরনের কার্যের আনন্দবৃদ্ধি অথবা আনন্দ হ্রাসের ক্ষমতার প্রবণতা অনুসারে কোন কাজকে অনুমোদন অথবা অনুমোদিত করে।”^x

বেঙ্হামের মতে, দুটি সার্বজনীন নিয়ন্ত্রকের দ্বারা সব মানুষ নিয়ন্ত্রিত হয় - সুখ এবং দুঃখ। তাঁর মতে, যদি কোন কাজ সর্বাধিক আনন্দ উৎপাদনে সক্ষম হয় তবে তা নৈতিক, অন্যথায় অনৈতিক হবে। কর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্রাথমিক প্রেরণা দেয় আনন্দ ও দুঃখ। এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, এই সুখ ও দুঃখ কার? তার উত্তর দিতে গিয়ে বেঙ্হাম বলেন এটি কোন



ব্যক্তি বিশেষে সুখ বা দুঃখ নয়। কারণ ব্যক্তি স্বভাবতই জানে সাধারণের সুখের মধ্যে তার নিজের সুখ বর্তমান। এই মতবাদকে সার্বিক সুখবাদও বলা যেতে পারে।

মিল তাঁর Utilitarianism গ্রন্থে উপযোগিতার নীতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, কোন কার্য সেই পরিমাণ নৈতিক হবে যে পরিমাণ আনন্দ সেই কার্য উৎপন্ন করবে এবং সেই পরিমাণ অনৈতিক হবে যে পরিমাণ আনন্দের বিপরীত উৎপন্ন করবে। আনন্দ বলতে সুখ এবং দুঃখের অভাবকে বোঝানো হয়েছে, এবং নিরানন্দ বলতে দুঃখের উপস্থিতি ও সুখের অভাবকে বোঝানো হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র তার ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থে এই উপযোগিতা নীতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, “...যদি ভূতমাত্রের হিতসাধন ধর্ম হয়, তবে এক জনের হিতসাধন ধর্ম, আবার একজনের হিতসাধন অপেক্ষা দশ জনের তুল্য হিতসাধন অবশ্য দশগুণ ধর্ম। যদি একদিকে একজনের হিতসাধন ও আর একদিকে দশজনের তুল্য হিতসাধন পরস্পর বিরুদ্ধ কর্ম হয়, তবে একজনের হিত পরিত্যাগ করিয়া দশ জনের তুল্য হিতসাধনই ধর্ম; এবং দশ জনের হিত পরিত্যাগ করিয়া এক জনের তুল্য হিতসাধন করা অধর্ম। এখানে “Good of the greatest number.”^{xi}

মিল, বেহুঁম, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ চিন্তাবিদেদের উপযোগবাদ বা হিতবাদকে সমর্থন করলেও তাদের মধ্যে সুখের মাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য আছে। বেহুঁমের মতে বিভিন্ন সুখের মধ্যে তুল্যমূল্য বিচারে পরিমাণই হল একমাত্র মাপকাঠি। তাঁর মতে সমস্ত সুখের মধ্যে কোন গুণগত তারতম্য নেই, আছে কেবল পরিমাণগত তারতম্য। তিনি তীব্রতা, স্থায়িত্ব, নিশ্চয়তা অথবা অনিশ্চয়তা, নৈকট্য অথবা দূরত্ব, উর্বরতা, বিশুদ্ধতা ও বিস্তার- এই সাতটি পরিস্থিতির বিচারে সুখের পরিমাণগত তুল্যমূল্য স্বীকার করেছেন। মিল তাঁর উপযোগবাদে সুখের মধ্যে গুণগত পার্থক্য স্বীকার করেছেন। তার মধ্যে সুখের কেবল পরিমাণগত পার্থক্য স্বীকার করলে পশু ও মানুষের কোন ভেদ থাকে না। এখানে প্রশ্ন ওঠে, সুখের এই গুণগত তারতম্য কিভাবে অনুধাবন করা যায়? উত্তরে মিল বলেন, যে সকল ব্যক্তির দুঃরকম সুখের অভিজ্ঞতা আছে, তারা সকলে বা অধিকাংশ ব্যক্তি কোনরকম ঔচিত্তবোধ বা বাধ্যবাধকতা ছাড়া যে সুখকে অধিক কাম্য বলে স্বীকার করবেন তা-ই উচ্চ স্তরের।

বঙ্কিমচন্দ্র উপযোগিতাবাদকে হিতবাদ বলতেন। তিনি বলেন সুখের পরিমাণগত ভেদ যেমন আছে তেমন গুণগত প্রভেদও বর্তমান। স্থায়ী ও ক্ষণিক ভেদে সুখ দু’প্রকার। ক্ষণিক সুখ আবার দু’প্রকার – ক্ষণিক কিন্তু পরিণামে দুঃখশূন্য এবং ক্ষণিক কিন্তু পরিণামে দুঃখের কারণ। অনুশীলনের মাধ্যমেই স্থায়ী সুখ লাভ করা যায়। ‘কিন্তু “স্থায়ী সুখ কি?” যখন এ প্রশ্ন উঠিল, তাহা তখন ইহার প্রথম উত্তর অবশ্য বলিতে হয় যে, অনন্তকাল স্থায়ী যে সুখ, ইহকাল পরকাল উভয় কালব্যাপী যে সুখ, সেই সুখ স্থায়ী সুখ’^{xii} আর যারা পরকালে বিশ্বাসী নয় তাদের জন্য ‘স্থায়ী সুখ’ বলতে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয় উত্তর দিয়েছেন। “ইহজীবনই যদি সব হইল, মৃত্যুই যদি জীবনের অন্ত হইল, তাহা হইলে, যে সুখ সেই অন্তকাল পর্যন্ত থাকিবে, তাহাই স্থায়ী সুখ।”^{xiii} ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয় অনুশীলন তত্ত্ব। অনুশীলনের মাধ্যমেই আমরা স্থায়ী সুখ লাভ করতে পারি। বঙ্কিমের মতে মানুষের কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক শক্তি আছে, তার অনুশীলনই সুখ। তাছাড়া আর কোনো সুখ নেই। এর অভাবই দুঃখ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় তিনি অনুশীলন ও অভ্যাসের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে, “অনুশীলন, শক্তির অনুকূল; অভ্যাস, শক্তির প্রতিকূল। অনুশীলনের ফল শক্তির বিকাশ, অভ্যাসের ফল শক্তির বিকার। অনুশীলনের পরিণাম সুখ, অভ্যাসের পরিণাম সহিষ্ণুতা।”^{xiv} উদাহরণস্বরূপ যে প্রত্যহ কুইনাইন খায় তার কুইনাইনের তিক্ত স্বাদ সহ্য হয়ে যায়। এটি অভ্যাস। আর মিষ্টি খেলে যে তৃপ্তি বা সুখের অনুভব হয় এটি অনুশীলন। ব্যক্তির ইন্দ্রিয় বৃত্তি অনুশীলন ও পরিতৃপ্তিই সুখ। এখানে প্রশ্ন ওঠে, ‘সুখের উপাদান কি?’ উত্তরে বলা যায়, -

প্রথম। শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের অনুশীলন। তজ্জনিত স্ফূর্তি ও পরিণতি।

দ্বিতীয়। সেই সকলের পরস্পর সামঞ্জস্য।

তৃতীয়। তার দৃশ্য অবস্থায় সেই সকলের পরিতৃপ্তি। ইহা ভিন্ন আর কোন জাতীয় সুখ নাই।^{xv}



নৈতিকতা প্রসঙ্গে কান্ট ও বঙ্কিমের তুলনামূলক বিশ্লেষণ : উপরোক্ত আলোচনার ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, কান্ট ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয় চিন্তাবিদই নৈতিকতা সম্পর্কে কর্তব্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কান্টের মতে কর্তব্য নির্ধারিত হয় যুক্তি বা বুদ্ধির সাহায্যে এবং কর্তব্যের ধারণাটি সার্বজনীন বা সার্বিক। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে কর্তব্য ধর্ম দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তা সামাজিকতা দ্বারা প্রভাবিত হয়। কান্ট নৈতিকতার ক্ষেত্রে বুদ্ধির অপরিসীম গুরুত্বের কথা বলেছেন। তাঁর মতে বৌদ্ধিক সংহতি হল নৈতিকতার চূড়ান্ত কর্তৃত্ব। কান্টের মতে ধর্মই নৈতিকতা। আর নিরপেক্ষ বা শতহীন অনুজ্ঞাই হলো ঈশ্বর।^{xvi} বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শনেও আমরা অনুরূপ ভাবনা দেখতে পাই। তাঁর মতে, কর্মের বা আচরণের নৈতিকতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনেক সময় ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা ত্যাগ করতে হয়। আত্মরক্ষা থেকে সমাজ রক্ষা বড় ধর্ম আবার সমাজ রক্ষা থেকে স্বদেশ রক্ষা বড় ধর্ম। তার দর্শনে ধর্ম ও নৈতিকতা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং ঈশ্বর হলেন ধর্মের ভিত্তি। হিন্দু নীতিতত্ত্ব কখনো হিন্দু ধর্ম থেকে পৃথকভাবে গড়ে ওঠেনি। ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থে পরলোক ছাড়া ধর্মের আলোচনা করলেও তিনি ঈশ্বরকে কখনোই ধর্ম থেকে পৃথক করে আলোচনা করতে চাননি। ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই অবস্থান করেন। তাই আত্মরক্ষা অপেক্ষা সমাজ রক্ষা বা দেশরক্ষা পরম ধর্ম। নিজেকে রক্ষা করা যেমন নৈতিক কর্ম, তেমনি সকল জীবকে রক্ষা করাও নৈতিক কর্ম। কাজেই আত্মপ্রেম স্বজন প্রেম বা দেশপ্রেমের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। দেশপ্রেমই মানুষের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। কর্তব্য পালনের মধ্যেই নিহিত আছে প্রকৃত সুখ। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, -

“ধর্ম যদি যথার্থ সুখের উপায় হয়, তবে মনুষ্য জীবনের সর্বাংশই ধর্ম করতে শাসিত হওয়া উচিত ইহাই হিন্দু ধর্মের প্রকৃত মর্ম।”^{xvii}

উভয়ের মতেই ধর্মের অনিবার্য পরিণতি হল সুখ। মানুষ কর্তব্যবোধ থেকে কর্ম করলে স্থায়ী সুখের অধিকারী হতে পারে।

নৈতিকতা প্রসঙ্গে কান্ট ও বঙ্কিমের মতের সাদৃশ্য পাওয়া গেলেও তাদের বৈসাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়। কান্ট নৈতিক নিয়ম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সার্বজনীনতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে সেই ব্যক্তিগত নিয়ম অনুযায়ীই আমাদের কাজ করা উচিত যেগুলিকে সার্বিক বা সার্বজনীন বিধিতে পরিণত করা যায়। অর্থাৎ পরিস্থিতি নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রে এই নীতি সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। প্রেক্ষাপটে তিনি গুরুত্ব দেননি। যেকোনো প্রেক্ষাপটে সকল যুক্তি-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের জন্য একই নীতি প্রযুক্ত হবে। সমস্ত রকমের আবেগ, অনুভূতি ইত্যাদিকে সংযত রেখে কেবল বিবেকের নির্দেশে কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করাই হল নৈতিক কর্ম। নৈতিক কাজকে হতে হবে নিয়মভিত্তিক, যা ব্যবহারিক বুদ্ধি বা Practical Reason অর্থাৎ বিবেক থেকে নিঃসৃত হয়। আমাদেরই বুদ্ধি বা অন্তর থেকে নির্গত হয় বলে নিয়মটি সাক্ষাৎ প্রতীতিলব্ধ বা Intuitive। কান্টের এই মতবাদ বিচারবাদ বা কৃচ্ছতাবাদ (Rationalism or Asceticism) হিসাবে পরিচিত। যেখানে একটি চরম নিয়ম মেনে চলার কথা বলা হয়। এখানে ফলাফলের কোন ভূমিকা স্বীকৃত হয়নি। কর্তব্যের প্রতি আনুগত্যই চরম লক্ষ্য। কান্ট কোন বিশেষ ধর্মের উল্লেখ করেননি, ধর্মনিরপেক্ষতা, যুক্তি ও বিমূর্ত নীতির ওপরেই তিনি যাবতীয় গুরুত্ব আরো করেছেন। তার নৈতিকতার মূল বৈশিষ্ট্য হল সার্বজনীনতা।

অপরদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের মত উপযোগতাবাদ বা হিতবাদ হিসাবে পরিচিত। এই মতবাদে ফলাফলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কোন কাজ নৈতিক বা অনৈতিক তার নির্ধারিত হয় কোন কর্ম কতটা সুখ বা দুঃখ উৎপন্ন করবে তার উপর। বঙ্কিম মূলত মিলে উপযোগবাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। ফলে উপযোগবাদ ও বিচারবাদের মধ্যে যে তাত্ত্বিক পার্থক্য তা এখানে পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু ধর্মশাস্ত্র, পুরান ইত্যাদির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তিনি পরলোক ব্যতিরেকে ধর্মের আলোচনা করতে আগ্রহী হলেও ধর্ম থেকে ঈশ্বরকে কখনোই বিচ্যুত করেননি। সকলের মধ্যেই একই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান। অজ্ঞানের জন্যই আমরা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারি না। তাই ভক্তির পথ ত্যাগ করে, বর্বরের ন্যায় জীবনযাপন করি। ভক্তিবৃত্তি ও প্রেমবৃত্তির অনুশীলনের মধ্য দিয়ে এই বাধা অতিক্রম করা যায়। এটিই হল জ্ঞান-ভক্তি সমুচ্চয়বাদ, যা ভারতীয় দর্শনে মোক্ষ লাভের অন্যতম পন্থা। কাজেই বঙ্কিমের অনুশীলনতত্ত্ব কেবলমাত্র পাশ্চাত্যের অনুকরণ নয় বরং হিন্দু ধর্মেরও সারাংশ।



সিদ্ধান্ত : ইমানুয়েল কান্ট ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নৈতিক দর্শন আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় নীতি দর্শনে তাঁদের অবদান অতুলনীয়। কান্ট দায়িত্বকেন্দ্রিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে একটি শক্তিশালী সার্বজনীন নৈতিক আইন প্রতিষ্ঠা করেন, যা নৈতিক আচরণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যা পরিস্থিতি নিরপেক্ষ। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপযোগিতাবাদ এবং ভারতীয় কর্মবাদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা নৈতিকতা সামাজিক বিকাশ ও আধ্যাত্মিক বিকাশের গুরুত্ব তুলে ধরে। তাঁর রচনার দ্বিতীয় ভাগে গীতার প্রভাব অনস্বীকার্য। তার নৈতিকতা কর্তব্য গঠনেও প্রভাব ফেলে। নৈতিক যুক্তির এই বিভিন্ন পন্থাগুলি বর্তমানে নৈতিক আলোচনাকে সমৃদ্ধ করে। বর্তমান সমাজে মূল্যবোধ ও একত্বের ধারণা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কান্টের সার্বজনীন নীতি খুবই প্রাসঙ্গিক। অপরদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের নৈতিকতা মূল্যবোধ গড়ে তোলা ও সামাজিক বাস্তবতার ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয়। এই দার্শনিক আলোচনাটি সার্বজনীন নৈতিক বাধ্যবাধকতা ও পরিস্থিতির ভারসাম্য বজায় রেখে কর্তব্য করার একটি মেলবন্ধন ঘটিয়েছে।

Reference:

- i. Kant, Immanuel. *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Translated and edited by Mary Gregor, Cambridge University Press, 1977, p. 7
- ii. “A good will is not good because of what it effects or accomplishes, because of its fitness to attain some proposed end, but only because of its volition, that is, it is good in itself...” Ibid, p. 8
- iii. Ibid, p. 10
- iv. Kant, Immanuel. *Critique of Practical Reason and Other Works on the Theory of Ethics*. Translated by T. K. Abbott, Longman’s Green and Co., 1990. P. 126
- v. Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, trans. Mary Gregor, Cambridge University Press, 1997, p. 31
- vi. Ibid, p. 41
- vii. Ibid, p. 44-46
- viii. “Virtue is the strength of the man's maxim in his obedience to duty.” Kant, Immanuel. *Critique of Practical Reason and Other Works on the Theory of Ethics*. Translated by T. K. Abbott, Longman’s Green and Co., 1990. P. 305
- ix. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *বঙ্কিম রচনাবলী*. খণ্ড ২, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গাব্দ ১৩৬১, পৃ. ২৭২
- x. Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, printed in the year 1780 and first published in 1789, ch. 1
- xi. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *বঙ্কিম রচনাবলী*. খণ্ড ২, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গাব্দ ১৩৬১, পৃ. ৬৫৩
- xii. ঐ, পৃ. ৬০২
- xiii. ঐ, পৃ. ৬০৪
- xiv. ঐ, পৃ. ৫৮৭
- xv. ঐ, পৃ. ৫৮৮
- xvi. “God became simple a name for the Categorical Imperative itself or a name for a purely subjective projection of a voice speaking through a moral law” - Copleston, Frederick Charles. *History of Philosophy: Modern Philosophy*. Image, 1963. P. 179
- xvii. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র. *বঙ্কিম রচনাবলী*. খণ্ড ২, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গাব্দ ১৩৬১, পৃ. ৫৯৬